سورة المزمل

সূরা মুয্যাম্মিল

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২০ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ
قَلِيْلًا ﴿٣﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ﴿٤﴾ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ
قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ﴿٦﴾
اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ﴿٧﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ
تَبْتِيْلًا ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ﴿٩﴾
وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِيْ وَ
الْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا
﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَ
الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ
رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ فَعَصٰى
فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْ
تُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٧﴾ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ كَانَ
وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ
سَبِيْلًا ﴿١٩﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ

وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۚ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ
عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۚ
عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ
فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ
قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ
اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হে বস্ত্রাবৃত, (২) রাত্রিতে ইবাদতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে; (৩) অর্ধ রাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। (৫) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। (৬) নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (৭) নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। (৯) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে। (১০) কাফিররা যা বলে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (১১) বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপ-কারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। (১২) নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড, (১৩) গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৪) যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ। (১৫) আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে তোমাদের জন্য সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফিরাউনের কাছে একজন রসূল। (১৬) অতঃপর ফিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। (১৭) অতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সে দিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ? (১৮) সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (১৯) এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার

দিকে পথ অবলম্বন করুক। (২০) আপনার পালনকর্তা জানেন আপনি ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্ দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বস্ত্রাবৃত, [এভাবে সম্বোধন করার কারণ এই যে, নবুয়তের প্রথমভাগে কোরাইশরা তাদের 'দারুন্নদওয়া' তথা পরামর্শ গৃহে একত্রিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপযুক্ত ও সর্বসম্মত খেতাব সম্পর্কে পরামর্শ করে। কেউ বলল ঃ তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী। অন্যেরা তাতে সায় দিল না। কেউ বলল ঃ তিনি উন্মাদ। এটাও অগ্রাহ্য হয়ে গেল। আবার কেউ বলল ঃ তিনি যাদুকর। এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল। কিন্তু অনেকেই এর কারণ বর্ণনা করল যে, তিনি বন্ধুকে বন্ধু থেকে পৃথক করে দেন। যাদুকর খেতাবই তাঁর জন্য উপযুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ পেয়ে খুবই দুঃখিত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত হয়ে গেলেন। প্রায়ই দুঃখ ও বিষাদের সময় মানুষ এরূপ করে থাকে। তাই তাঁকে প্রফুল্ল করার জন্য ও কৃপা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে; যেমন হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার হযরত আলী (রা)-কে আবূ তোরাব বলে সম্বোধন করেছিলেন। সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে যে, এ সব বিষয়ের কারণে আপনি দুঃখ করবেন না এবং আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আরও বেশী মনোনিবেশ করুন, এভাবে যে] রাত্রিতে (নামাযে) দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অর্থাৎ অর্ধ রাত্রি (এতে বিশ্রাম গ্রহণ করুন) অথবা তদপেক্ষা কম। দণ্ডায়মান হোন এবং অর্ধেকের বেশি সময় আরাম করুন অথবা অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী (দণ্ডায়মান হোন এবং অর্ধেকের চেয়ে কম সময়ে বিশ্রাম করুন। সারকথা, রাত্রিতে নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া তো ফরয হল কিন্তু সময়ের পরিমাণ কতটুকু হবে তা ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে---তিনটির মধ্য থেকে যে কোন একটি—অর্ধ রাত্রি, দুই-তৃতীয়াংশ রাত্রি, এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি) এবং (এই দণ্ডায়মান অবস্থায়) কোরআন স্পষ্টভাবে পাঠ করুন (অর্থাৎ প্রত্যেকটি অক্ষর পৃথক পৃথক উচ্চারিত হওয়া চাই। নামাযের বাইরেও এভাবে পাঠ করার আদেশ আছে। অতঃপর এই আদেশের কারণ ও উপযোগিতা বর্ণনা করা হয়েছে) আমি আপনার প্রতি এক ভারী কালাম অবতীর্ণ করব

[অর্থাৎ কোরআন মজীদ, যা অবতরণের সময় তাঁর অবস্থা পরিবর্তন করে দিত। হাদীসে আছে, একবার ওহী নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উরু যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর উরুতে রাখা ছিল। ফলে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর উরু ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) উষ্ট্রীর উপর সওয়ার অবস্থায় ওহী নাযিল হলে উষ্ট্রী বোঝার ভারে ঝুঁকে পড়ত এবং নড়াচড়া করতে পারত না। কনকনে শীতের মধ্যে ওহী নাযিল হলেও তার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এ ছাড়া কোরআনকে সংরক্ষিত রাখা ও অপরের কাছে পৌঁছানোও কষ্টসাধ্য ছিল। এসব কারণে 'ভারী কালাম' বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে দণ্ডায়মান হওয়াকে কঠিন মনে করবেন না। আমি তো আরও ভারী কাজ আপনাকে সোপর্দ করব। আপনাকে সাধনায় অভ্যস্ত করার জন্যই এই আদেশ করা হয়েছে। যে ভারী কালাম আপনার প্রতি নাযিল করব, তার জন্য শক্তিশালী যোগ্যতা দরকার। অতঃপর দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করা হয়েছে] নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তিদলনে খুব সহায়ক এবং (দোয়া হোক কিংবা কিরাআত) স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (অবসর মুহূর্তে হওয়ার কারণে দোয়া ও কিরা-আতের ভাষা ধীর ও শান্তভাবে উচ্চারিত হয় এবং একাগ্রচিত্ততাও হাসিল হয়। অতঃপর তৃতীয় একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, এতে রাত্রির বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে---) নিশ্চয় দিবাভাগে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা রয়েছে (সাংসারিক---যেমন গৃহস্থালীর কাজকর্ম এবং ধর্মীয় যেমন প্রচার কাজ। তাই রাত্রিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রাত্রি ছাড়া অন্যান্য সময়েও আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন অর্থাৎ স্মরণ ও মগ্নতা সার্বক্ষণিক ফরয। একাগ্রচিত্ততার অর্থ আল্লাহ্র সম্পর্ক সবকিছুর উপর প্রবল হওয়া। অতঃপর তওহীদসহ এ বিষয়ের তাকীদ করা হয়েছে) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই কর্মবিধা-য়করূপে গ্রহণ করুন। কাফিররা যা বলে, তজ্জন্যে সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। [অর্থাৎ তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। 'সুন্দরভাবে' এই যে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রতিশোধের চিন্তা করবেন না। অতঃপর তাদের আযাবের সংবাদ দিয়ে রসূলল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে] বিত্তবৈভবের অধিকারী মিথ্যা-রোপকারীদেরকে (বর্তমান অবস্থায়) আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে আরও কিছু দিন অবকাশ দিন। (অর্থাৎ আরও কিছু দিন সবর করুন। সত্বরই তাদের শাস্তি হবে। কেন না) আমার কাছে আছে শিকল, অগ্নি, গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং মর্মন্তুদ শাস্তি। (সুতরাং তাদেরকে এসব বস্তু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে এবং তা সেদিন হবে,) যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ (চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে) বহমান বালুকা-স্তূপ হয়ে যাবে (এবং উড়তে থাকবে। অতঃপর মিথ্যারোপকারীদেরকে সরাসরি সম্বো-ধন করা হয়েছে এবং রিসালত ও শাস্তি সপ্রমাণও করা হয়েছে) নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে এমন একজন রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি (কিয়ামতের দিন তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন যে, ধর্ম প্রচারের পর তোমরা কি ব্যবহার করেছ), যেমন ফিরাউনের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর ফিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল। ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। অতএব তোমরা যদি (রসূল প্রেরণের পর নাফরমানী ও) কুফরী

কর, তবে (এমনিভাবে তোমাদেরকেও একদিন দুর্ভোগ পোহাতে হবে। সেই দুর্ভোগের দিন সামনে আছে। অতএব তোমরা) সেই দিন (অর্থাৎ সেই দিনের বিপদ) থেকে কিরূপে আত্মরক্ষা করবে, যা (ভয়াবহতা দৈর্ঘ্যের কারণে) বালককে করে দিবে বৃদ্ধ! সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (এটা টলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই)। এটা (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়বস্তু) একটা (সারগর্ভ) উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার দিকে রাস্তা অবলম্বন করুক। (অর্থাৎ তাঁর কাছে পৌঁছার জন্য ধর্মের পথ অবলম্বন করুক। অতঃপর সূরার শুরুতে বর্ণিত রাত্রির ইবাদত ফরয হওয়ার আদেশ রহিত করা হচ্ছেঃ) আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবং আপনার কতক সহচর (কখনও) রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, (কখনও) অর্ধাংশ এবং (কখনও) এক-তৃতীয়াংশ (নামাযে) দণ্ডায়মান হন। দিবা ও রাত্রির পূর্ণ পরিমাপ আল্লাহ্ তা'আলাই করতে পারেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। (ফলে তোমরা খুবই কষ্ট ভোগ কর। কেননা, অনুমান করলে কম হওয়া সন্দেহ থাকে এবং অনুমানের চেয়ে বেশী করলে সারারাত্রি ব্যয়িত হয়ে যায়। উভয় বিষয়ে আত্মিক ও দৈহিক কষ্ট আছে)। অতএব (এসব কারণে) তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং পূর্ববর্তী আদেশ রহিত করে দিয়েছেন। কাজেই (এখন) কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু পাঠ কর। (এখানে কোরআন পাঠ করার অর্থ তাহাজ্জুদ পড়া। কারণ, এতে কোরআন পাঠ করা হয়। এই আদেশ মোস্তাহাব বিধান প্রমাণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদ পড়া আর ফরয নয়। এই আদেশ রহিত। এখন যতক্ষণ পার মোস্তাহাব হিসাবে ইচ্ছা করলে পড়ে নাও। রহিত হওয়ার আসল কারণ কষ্ট। عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوْهُ থেকে তা বোঝা যায়। পূর্ববত বিষয়বস্তু এর ভূমিকা। অতঃপর রহিত করণের দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হচ্ছেঃ) তিনি (আরও) জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ জীবিকা অন্বেষণে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। (এসব অবস্থায় নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া কঠিন। তাই আদেশ রহিত করা হয়েছে। কাজেই এ কারণেও অনুমতি আছে যে) কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ কর। (তাহাজ্জুদ রহিত হয়ে গেলেও এই আদেশ এখনও বহাল আছে যে) তোমরা (ফরয) নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম (অর্থাৎ আন্তরিকতাপূর্ণ) ঋণ দাও। তোমরা যে সৎ কর্ম নিজেদের জন্য অগ্রে (পরকালের পুঁজি করে) পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তমরূপে গচ্ছিত থাকবে এবং পুরস্কার হিসাবে বর্ধিতরূপে পাবে। (অর্থাৎ সাংসারিক কাজে ব্যয় করলে যে প্রতিদান ও উপকার পাওয়া যায়, সৎ কাজে ব্যয় করলে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে)। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ক্ষমা প্রার্থনা করাও বহাল নির্দেশাবলীর অন্যতম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - مزمل এবং পরবর্তী সূরায় ব্যবহৃত مدثر শব্দদ্বয়ের অর্থ

প্রায় এক অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত। উভয় সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব করছিলেন এবং বস্ত্রাবৃত হয়েছিলেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরিগুহায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে ইক্‌রা সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত খাদিজা (রা)-র নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন ঃ زملونى , زملونى অর্থাৎ 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও।' এর পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে 'ফতরাতুল-ওহী' বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন ঃ একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একস্থানে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম ঃ আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আয়াত নাযিল হল। এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপের বর্ণনানুযায়ী এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণা ও অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।---(রূহুল মা'আনী) এই বিশেষ ভঙ্গিতে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে এবং এর কিছু বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

তাহাজ্জুদ নামাযের বিধানাবলী ঃ مدثر ও مزمل শব্দদ্বয় থেকেই বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কোরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঞ্জেগানা নামায ফরয ছিল না। পাঞ্জেগানা নামায মে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখের হাদীসদৃষ্টে ইমাম বগভী (র) বলেন ঃ এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ রাত্রির নামায রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সমগ্র উম্মতের উপর ফরয ছিল। এটা পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার পূর্বের কথা।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায কেবল ফরযই করা হয়নি বরং তাতে রাত্রির কম-পক্ষে এক-চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। কারণ আয়াতের মূল আদেশ

হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকা। কিছু অংশ বাদ দেওয়ার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম বগভী (র) বলেন ঃ এই আদেশ পালনার্থে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যয় করতেন। ফলে তাঁদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কণ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাযে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ নামায পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায পড়াই তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট। এই বিষয়বস্তু আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মে'রাজের রাত্রিতে পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজ্জুদ সুন্নত থেকে যায়। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সা) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। ---(মাযহারী)

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا — اللَّيْل শব্দের সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত হওয়ার অর্থ হয়েছে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ আপনি সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ অর্থাৎ এখন আপনি অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী নামাযে মশগুল হোন। এটা إِلَّا قَلِيلًا ব্যতিক্রমের বর্ণনা। তাই প্রশ্ন হয় যে, অর্ধেক রাত্রি তো কিছু অংশ হতে পারে না। জওয়াব এই যে, রাত্রির প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও ইশার নামায ইত্যাদিতে অতিবাহিতই হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাত্রির অর্ধেক। সেটা সারা রাত্রির তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরাত্রির কমেরও অনুমতি আছে, বেশীরও আছে। তাই সমষ্টিগতভাবে এর সারমর্ম এই যে, কম-পক্ষে এক-চতুর্থাংশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশী নামাযে মশগুল থাকা ফরয।

تَرْتِيل قُرْآن এর অর্থ ঃ تَرْتِيل-এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা।---(মুফরাদাত) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দ্রুত কোরআন তিলাওয়াত করবেন না বরং সহজভাবে এবং অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে উচ্চারণ করবেন।---(কুরতুবী) رَتِّلْ বলে রাত্রির নামাযে করণীয় কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামায কেরাআত, তসবীহ, রুকূ, সিজদা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কোরআন পাঠ। একারণেই সহীহ হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদের নামায অনেক লম্বা করে আদায় করতেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল কোরআন পাঠই কাম্য নয় বরং তরতীল তথা সহজ ও সঠিকভাবে পাঠ কাম্য। রসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবেই পাঠ করতেন। রাত্রির নামাযে তিনি কিরূপে কোরআন তিলাওয়াত করতেন, এই প্রশ্নের জওয়াবে হযরত উম্মে সালমা (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিরাআত অনুকরণ করে শোনান তাতে প্রত্যেকটি হরফ স্পষ্ট ছিল।---(মাযহারী)

যথা সম্ভব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও তরতীলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করেন, তাঁর কিরা'আতের মত অন্য কারও কিরা'আত আল্লাহ্ তা'আলা শুনেন না।---(মাযহারী)

হযরত আলকামা (রা) এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে তিলাওয়াত করতে দেখে বললেনঃ لقد رتل القران فدا ٤ ابى وامى----অর্থাৎ সে কোরআন তরতীল করেছে; আমার পিতামাতা তারজন্য উৎসর্গ হোন।--(কুরতুবী)

তবে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তরতীল। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا আয়াতে যে তরতীলের আদেশ করেছেন, এটাই সেই তরতীল।---(কুরতুবী)

قَوْلٌ ثَقِيْلٌ—اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (ভারী কালাম) বলে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন বর্ণিত হালাল, হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের সীমা স্থায়ীভাবে মেনে চলা স্বভাবত ভারী ও কঠিন। তবে যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সহজ করে দেন, তার কথা স্বতন্ত্র। কোরআনকে ভারী বলার আরেক কারণ এই যে, কোরআন নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষ ওজন ও তীব্রতা অনুভব করতেন। ফলে প্রচণ্ড শীতেও তাঁর মস্তক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তিনি তখন কোন উটের উপর সওয়ার থাকলে বোঝার কারণে উট নুয়ে পড়ত।---(বুখারী)

এই আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষকে কষ্টে অভ্যস্ত করার জন্য তাহাজ্জুদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। রাত্রিকালে নিদ্রার প্রাবল্য এবং মানসিক সুখের বিরুদ্ধে এটা একটা জিহাদ। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোরআন অবতীর্ণ কষ্টসাধ্য ও ভারী বিধি বিধান সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে।

ناشئة اللّيل — إنّ ناشئة — ناشئة শব্দটি ধাতু। এর অর্থ রাত্রির নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রার পর নামাযের জন্য গাত্রোত্থান করা। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। কারণ, এর শাব্দিক অর্থও রাত্রিতে নিদ্রার পর উঠে নামায পড়া। ইবনে কায়সান (রা) বলেন ঃ শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করাকে ناشئة الليل বলা হয়। ইবনে যায়েদ (রা) বলেন ঃ রাত্রির যে অংশতে কোন নামায পড়া হয়, তা ناشئة الليل এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবী মুলায়কা (রা) এক প্রশ্নের জওয়াবে হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের (রা)ও তাই বলেছেন।—(মাযহারী)

এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাত্রির যে কোন অংশে যে নামায পড়া হয়, বিশেষত ইশার পর যে নামায পড়া হয়, তাই قيام الليل ও ناشئة الليل-এর মধ্যে দাখিল, যেমন হাসান বসরী (র) বলেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা), সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও বুযুর্গগণ সর্বদাই এই নামায নিদ্রার পর শেষরাত্রে জাগ্রত হয়ে পড়তেন। তাই এটা উত্তম ও অধিক বরকতের কারণ। তবে ইশার নামাযের পর যে কোন নফল নামায পড়া যায়, তাতে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

هِيَ أَشَدُّ وَطْأً — وطأ শব্দে দুরকম কিরা'আত আছে। প্রসিদ্ধ কিরা'আতে ওয়াও এর উপর যবর এবং ত্বোয়া সাকিন করে অর্থ দলন করা, পিষ্ট করা। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির নামায প্রবৃত্তি দলনে খুবই সহায়ক অর্থাৎ এতে করে প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং অবৈধ বাসনা থেকে বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই কিরা'আত অবলম্বন করা হয়েছে। দ্বিতীয় কিরা'আত হচ্ছে قتا ب-এর ওজনে وطاء-এমতাবস্থায় এটা অনুকূল হওয়ার অর্থে ধাতু। لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ আয়াতেও শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যায়েদ (রা) থেকে এই অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ (রা) বলেনঃ উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে নামাযের জন্য গাত্রোত্থান করা অন্তর, দৃষ্টি, কর্ণ ও জিহবার মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ أشد وطأ-এর অর্থ এই যে, কর্ণ ও অন্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাত্মতা থাকে। কারণ, রাত্রিবেলায় সাধারণত কাজকর্ম ও হট্টগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, কর্ণও তা শুনে ও অন্তরও উপস্থিত থাকে।

اقوم- শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। অর্থাৎ রাত্রিবেলায় কোরআন তিলাওয়াত

অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয় না।

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এই আয়াতেও তাহাজ্জুদের রহস্য বর্ণিত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিজ সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত ও রহস্যটি সমস্ত উম্মতের জন্য ব্যাপক।

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا—سبح শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাফেরা করা। এ কারণেই সাঁতার কাটাকেও سبح ও سباحة বলা হয়। এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা, শিক্ষা দেওয়া, প্রচার করা, মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত অথবা নিজের জীবিকার অন্বেষণে ঘোরাফেরা করা ইত্যাদি সবই এতে দাখিল।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের তৃতীয় রহস্য ও উপযোগিতা বর্ণিত হয়েছে। এটাও সবার জন্য ব্যাপক। রহস্য এই যে, দিবাভাগে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও অন্য সবাইকে অনেক কর্মব্যস্ততায় থাকতে হয়। ফলে একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাত্রি একাজের জন্য থাকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিদ্রা ও আরাম এবং তাহাজ্জুদের ইবাদতও হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য ঃ ফিকাহ্‌বিদগণ বলেন ঃ যে সব আলিম ও মাশায়েখ জনগণের শিক্ষাদীক্ষা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদেরও এ কাজ দিবাভাগে সীমিত রেখে রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত ও ইবাদতে মশগুল হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণের কর্মপদ্ধতি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে যদি কোন সময় রাত্রিবেলায়ও উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক ব্যতিক্রম হতে পারে। এর সাক্ষ্য ও অনেক আলিম ও ফিকাহ্‌বিদের কর্ম থেকে পাওয়া যায়।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا—تبتل-এর শাব্দিক অর্থ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাযের আদেশ দেওয়ার পর এই আয়াতে এমন এক ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা রাত্রি অথবা দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় বরং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা, একথা কল্পনাও করা যায় না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন না, তাই এ আদেশ করা হয়েছে।---(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিবারাত্রি সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; এতে কোন সময় অবহেলা ও অনবধানতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এটা তখনই হতে পারে, যখন স্মরণ করার অর্থ ব্যাপক নেওয়া হয় অর্থাৎ মুখে, অন্তরে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে ব্যাপৃত রেখে ইত্যাদি যে কোন প্রকারে স্মরণ করা। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ كان يذكر الله على كل حين অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন। এটাও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে শুদ্ধ হতে পারে। কেননা, প্রস্রাব-পায়খানার সময় তিনি যে মুখে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন না, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তবে আন্তরিক স্মরণ সর্বাবস্থায় হতে পারে। আন্তরিক স্মরণ দুই প্রকার--১. শব্দ কল্পনা করে স্মরণ করা এবং ২. আল্লাহ্‌র গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।---(মাওলানা থানভী)

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় আদেশ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا---অর্থাৎ আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানে ও ইবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে ইবাদতে শিরক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল। হযরত ইবনে যায়েদ (রা) বলেন ঃ تبتل -এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা।---(মাযহারী) কিন্তু এই تبتل তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رهبانيت তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে لا رهبانية فى الاسلام বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, শরীয়তের পরিভাষায় رهبانية-এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে ইবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস থাকা যে, এসব হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে না, অথবা ওয়াজিব হকে ত্রুটি করে কার্যত সম্পর্কচ্ছেদ করা। আর এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের উপর কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেওয়া। এ ধরনের সম্পর্কচ্ছেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থী নয়; বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। পয়গম্বরগণের সুন্নত ; বিশেষত পয়গম্বরকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মোস্তাফা (সা)-র সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে تبتل শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীনের ভাষায় এরই অপর নাম 'ইখ্‌লাস'।---(মাযহারী)

জ্ঞাতব্য ঃ অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং সাংসারিক সম্পর্ক ত্যাগ করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সূফী বুযুর্গগণ সবার অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা বলেন ঃ

আমরা যে দূরত্ব অতিক্রম করার কাজে দিবারাত্রি মশগুল আছি, প্রকৃতপক্ষে তার দু'টি স্তর আছে---প্রথম স্তর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ্ পর্যন্ত পেঁ ৗছা। উভয় স্তর পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোচ্য আয়াতে এ দু'টি স্তরই পর পর দুই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ১. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ এবং ২. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

এখানে আল্লাহ্কে স্মরণ করার অর্থ সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণ করা, যাতে কখনও ত্রুটি ও শৈথিল্য দেখা না দেয়। এই স্তরকেই সূফী-বুযুর্গগণের পরিভাষায় وصول الى الله আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা বলা হয়। এভাবে প্রথম বাক্যে শেষ স্তর এবং শেষ বাক্যে প্রথম স্তর উল্লিখিত হয়েছে। এই ক্রম পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত এই যে, দ্বিতীয় স্তরই আল্লাহ্র পথের পথিকের আসল উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। তাই এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করার জন্য স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। শেখ সাদী (র) উপরোক্ত দু'টি স্তর চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

تعلق حجاب است و بے حاصلی — چو پیوند ها بگسلی واصلی

ইসমে যাতের যিকর অর্থাৎ বারবার 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' বলাও ইবাদত ঃ আয়াতে ইসম শব্দ উল্লেখ করে وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ বলা হয়েছে এবং وَاذْكُرْ رَبَّكَ বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসমে অর্থাৎ আল্লাহ্ বারবার উচ্চারণ করাও আদিষ্ট বিষয় ও কাম্য।---(মাযহারী) কোন কোন আলিম একে বিদ'আত বলেছেন। আয়াত থেকে জানা গল যে, তাদের এই উক্তি ঠিক নয়।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا---যাকে কোন কাজ সোপর্দ করা হয়, অভিধানে তাকে وكيل বলা হয়। কাজেই فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ কর। পরিভাষায় একেই তাওয়াক্কুল বলা হয়। এই সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম ইয়াকুব কারখী (র) বলেন ঃ সূরার শুরু থেকে এই আয়াত পর্যন্ত সুলুক তথা আল্লাহ্র পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে ১. রাত্রিবেলায় আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্জনে গমন, ২. কোরআন পাকে মশগুল হওয়া, ৩. সদা-সর্বদা আল্লাহ্র স্মরণ ৪. সৃষ্টির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং ৫. তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সর্বশেষ নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার গুণ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালন-কর্তা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগা গোড়া পূর্ণ করার যিম্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন এবং তার উপর যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে কখনও বঞ্চিত হবে না। কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছেঃ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার যাবতীয় প্রয়োজনাদি ও বিপদাপদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

তাওয়াক্কুলের শরীয়তসম্মত অর্থঃ আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করার অর্থ এরূপ নয় যে, জীবিকা উপার্জন ও আত্মরক্ষার যেসব উপকরণ ও হাতিয়ার আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন, সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে হবে। বরং তাওয়াক্কু-লের স্বরূপ এই যে, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উপকরণাদি পুরোপুরি ব্যবহার কর, কিন্তু বৈষয়িক উপকরণাদিতে অতিমাত্রায় মগ্ন হয়ে যেও না। ইচ্ছাধীন কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর ফলাফল আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

তাওয়াক্কুলের এই অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বগভী ও বায়হাকী (র) বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেনঃ

ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاتقوا الله واجملوا فى الطلب অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তখন পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হবে না, যে পর্যন্ত সে তার অবধারিত ও লিখিত রিযিক পুরোপুরি হাসিল না করে। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে এতদূর মগ্ন হয়ো না যে, অন্তরের সমস্ত অভিনিবেশ বৈষয়িক উপকরণাদির মধ্যেই সীমিত থেকে যায় এবং তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।---(মাযহারী) তিরমিযীতে আবূ যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ দুনিয়া ত্যাগ এর নাম নয় যে, তোমরা হালালকৃত বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য হারাম করে নেবে অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ অযথা উড়িয়ে দেবে; বরং দুনিয়া ত্যাগের অর্থ এই যে, তোমাদের কাছে যা আছে, তার তুলনায় আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তার উপর তোমাদের ভরসা বেশী হবে।---(মাযহারী)

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ---ইমাম কারখী (র)-র উক্তিমতে এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত ষষ্ঠ নির্দেশ। অর্থাৎ মানুষের উৎপীড়ন ও গালিগালাজে সবর করা। এটা আল্লাহ্‌র পথের পথিকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। উদ্দেশ্য এই যে, যাদের শুভেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সাধক তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন নিয়োজিত করে, প্রতিদানে তাদের পক্ষ থেকেই নির্যাতন ও গালিগালাজ শুনে উত্তম সবর করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের

কল্পনাও করবে না। সূফীগণের পরিভাষায় এই সর্বোচ্চ স্তর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا — هجر---এর শাব্দিক অর্থ বিষণ্ণ ও দুঃখিত মনে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। অর্থাৎ মিথ্যারোপকারী কাফিররা আপনাকে যেসব পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নেবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় মানুষের অভ্যাস এই যে, যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা হয়, তাকে গালমন্দ দেয়। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্পর্ক ত্যাগের আদেশ দিতে যেয়ে هَجْرًا جَمِيلًا শব্দ যোগ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনার উচ্চ পদমর্যাদার খাতিরে আপনি কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন এবং মুখেও তাদেরকে মন্দ বলবেন না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ পরবর্তীতে অবতীর্ণ জিহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তা করলে এরূপ বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের উৎপীড়নের কারণে সবর ও সম্পর্ক ত্যাগ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা হুমকি, শাস্তি ও জিহাদের পরিপন্থী নয়। এই আয়াতের নির্দেশ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং জিহাদে যে শাস্তির হুমকি আছে তার আদেশ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামী জিহাদ কোন প্রতিশোধ স্পৃহা ও ক্রোধবশত করা হয় না, যা সবর ও উত্তম সম্পর্ক ত্যাগের পরিপন্থী হবে। বরং জিহাদ বিশেষ আল্লাহ্র আদেশ প্রতিপালন মাত্র। সাধারণ অবস্থায় সবর ও সম্পর্ক ত্যাগও তেমনি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য কাফিরদের পরকালীন আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী অত্যাচার-অবিচারের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন। তবে বিশেষ রহস্যের তাগিদে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী আয়াত ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا---এর মর্ম তাই। এতে কাফিরদেরকে اولى النعمة বলা হয়েছে। نعمة শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে; দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া পরকাল অবিশ্বাসীরই কাজ হতে পারে। মু'মিনও মাঝে মাঝে এগুলো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তাতে মত্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না।

অতঃপর পরকালের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে انكال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা আছে--- وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ---এর অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, গলধঃকরণও করা যায় না এবং উদ্গীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের খাদ্য যরী ও যাক্কুমের অবস্থা তাই হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ তাতে আগুনের ফোঁটা থাকবে; যা গলায় আটকে যাবে।---(নাউযুবিল্লাহ্ মিনহু) শেষে বলা হয়েছেঃ وَعَذَابًا أَلِيمًا---নির্দিষ্ট আযাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরও অধিক কঠোরতা ও অকল্পনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের পরকাল ভীতিঃ ইমাম আহমদ, ইবনে আবী দাউদ, ইবনে আদী ও বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি কোরআন পাকের এই আয়াত শুনে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। হযরত হাসান বসরী (র) একদিন রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় সম্মুখে খাদ্য নীত হলে অন্তরে এই আয়াতের কল্পনা জেগে উঠে। তিনি খাদ্য গ্রহণ করতে পারলেন না। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আবার এই ঘটনা ঘটল। তিনি আবার খাদ্য ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন তিনি খাদ্য গ্রহণ করলেন না, তখন তাঁর পুত্র হযরত সাবেত বানানী, ইয়াযীদ যব্বী ও ইয়াহ্ইয়া বাক্কা (র)-র কাছে যেয়ে পিতার অবস্থা জানালেন। তাঁরা এসে বহু পীড়াপীড়ির পর তাঁকে সামান্য খাদ্য গ্রহণে সম্মত করলেন।---(রূহুল মা'আনী)

অতঃপর কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ ঘটনা বর্ণিত হয়েছেঃ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ---এরপর কাফিরদের ফিরাউন ও হযরত মূসার কাহিনী শুনিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ফিরাউন পয়গম্বর মূসা (আ)-কে মিথ্যারোপ করে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, তোমরা মিথ্যারোপ অব্যাহত রাখলে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে এমনি ধরনের আযাব আসতে পারে। শেষে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে এরূপ আযাব না আসলেও কিয়ামতের সেই দিনের আযাবকে ঠেকাতে পারবে না, যেদিন ভয়াবহ ও দীর্ঘ হওয়ার কারণে বালককে বৃদ্ধে পরিণত করে দেবে। বাহ্যত এতে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও কঠোরতা বিধৃত হয়েছে। সেদিন এমন ভীতি ও ত্রাস দেখা দেবে যে, বালকও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ একে উপমা বলেছেন এবং কারও মতে এটা বাস্তব সত্য। দিনটি এত দীর্ঘ হবে যে, বালকও বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে।---(কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

তাহাজ্জুদ আর ফরয নয়ঃ সূরার শুরুতে قُمِ اللَّيْلَ বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও

সকল মুসলমানের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই নামায অর্ধরাত্রির কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর একদল সাহাবী প্রায়ই রাত্রির অধিকাংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করে এই ফরয আদায় করতেন। প্রতি রাত্রিতেই এই ইবাদত এবং দিনের বেলায় দীনের দাওয়াত ও প্রচারকার্য, তদুপরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই মেহনতমজুরী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। নিয়মিতভাবে এই দীর্ঘ নামায আদায় করতে করতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের পদযুগল ফুলে যায়। তাঁদের এই কষ্ট ও শ্রম আল্লাহ্ তা'আলার অগোচরে ছিল না। কিন্তু তাঁর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল যে, এই পরিশ্রম ও মেহনতের ইবাদত ক্ষণস্থায়ী হবে, যাতে তাঁরা পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে যান। এর প্রতি إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا আয়াতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ এর চেয়ে ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী কোরআনের দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হবে, তাই আপনাকে এই কষ্ট ও পরিশ্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহ্র জ্ঞান অনুযায়ী যখন এই সাধনা ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে দেওয়া হল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেবল দীর্ঘ নামায রহিত হয়েছে এবং আসল তাহাজ্জুদের নামায পূর্ববৎ ফরয রয়ে গেছে। অতঃপর মি'রাজের রাত্রিতে যখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয করা হল, তখন তাহাজ্জুদের নামায আর ফরয রইল না।

বাহ্যত রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সমস্ত উম্মত থেকে এই রহিত ফরয হয়ে গেছে। তবে তাহাজ্জুদের নামায মোস্তাহাব এবং আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয়---এই বিধান এখনও বাকী আছে। এখন এই নামাযে কোন সময়সীমা এবং কোরআন পাঠের কোন বাঁধা-ধরা পরিমাণ রাখা হয়নি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি ও ফুরসত অনুযায়ী পড়তে পারে এবং যতটুকু সম্ভব কোরআন পাঠ করতে পারে।

শরীয়তের বিধান রহিত হওয়ার স্বরূপ ঃ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে তাদের আইন-কানুন পরিবর্তন ও রহিত করে থাকে। তবে এর বেশীর ভাগ কারণ, অভিজ্ঞতার পর নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে, যা পূর্বে জানা থাকে না। নতুন পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে প্রথম আইন রহিত করে অন্য আইন জারি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলীতে এরূপ কল্পনাও করা যায় না। কেননা, কোন নতুন বিধান জারি করার পর মানুষের কি অবস্থা দাঁড়াবে, কেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন। তাঁর সর্বব্যাপী ও চিরন্তন জ্ঞানের বাইরে কোন কিছু নেই। কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে কোন কোন বিধান আল্লাহ্র জ্ঞানে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জারি করা হয় এবং তা কারও কাছে প্রকাশ করা হয় না। ফলে মানুষ মনে করে যে, এই বিধান চিরকালের জন্য স্থায়ী। আল্লাহ্র কাছে নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন বিধানটি প্রত্যাহার করা হয়, তখন মানুষের দৃষ্টিতে তা রহিতকরণ বলে প্রতিভাত হয়। অথচ

প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা মানুষের কাছে একথা বর্ণনা করা ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে, বিধানটি চিরকালের জন্য নয়; বরং এই মেয়াদের জন্যই জারি করা হয়েছিল। এখন মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিধানও শেষ হয়ে গেছে।

কোরআন পাকের অনেক আয়াত রহিত হতে দেখে সাধারণভাবে যে সন্দেহ উত্থাপন করা হয়, উপরোক্ত বক্তব্যে তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন: এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল। তাঁরা সূরা বনী ইসরাঈলের وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ আয়াত-খানি এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। এতে বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দায়িত্বে তাহাজ্জুদের নামাযকে একটি অতিরিক্ত ফরয হিসাবে আরোপ করা হয়েছে। কেননা, نافلة শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত; মানে অতিরিক্ত ফরয। কিন্তু অধিকাংশের মতে এই নামায এখন কারও উপর ফরয নয়। তবে মোস্তাহাব সবার জন্যই। আয়াতে نَافِلَةً لَّكَ বলে পারিভাষিক নফল বোঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট আলোচনা সূরা বনী ইসরাঈলের তফসীরে দেখুন।

ফরয তাহাজ্জুদ রহিতকারী اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ থেকে فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ পর্যন্ত আয়াতখানি সূরার শুরুভাগের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার এক বছর অথবা আট মাস পর অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব পূর্ণ এক বছর পর ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। মসনদে আহমদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরার শুরুতে তাহাজ্জুদের নামায ফরয করে-ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এক বছর পর্যন্ত এই আদেশ পালন করতে থাকেন। সূরার শেষ অংশ বার মাস পর্যন্ত আকাশে আটকে রাখা হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার পর শেষ অংশ অবতীর্ণ হয় এবং তাতে ফরয তাহাজ্জুদ রহিত করে দেওয়া হয়। এরপর তাহাজ্জুদের নামায নিছক নফল ও মোস্তাহাব থেকে যায়।---(রূহুল মা'আনী)

এর পর রহিতকরণের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ

احصاء— শব্দের অর্থ গণনা করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা করতে পারবে না। কোন কোন তফসীরবিদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে এই নামাযে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কত-টুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। কেননা, তখনকার দিনে সময় জানার যন্ত্র ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। থাকলেও নামাযে মশগুল হয়ে বারবার ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁদের অবস্থা ও

খুশু-খুযুর পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিল না। আবার কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে احصاء শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যহ যথারীতি নামায পড়তে সক্ষম না হওয়া। শব্দটি এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন হাদীসে আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ من احصاها دخل الجنة অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামসমূহকে কর্মের ভেতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে। সূরা ইবরাহীমের তফসীরেও এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

تَوْبَةٌ—فَتَابَ عَلَيْكُمْ শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তওবাকেও এ কারণে তওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশেষে বলা হয়েছেঃ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

---অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায, যা এখন ফরযের পরিবর্তে মোস্তাহাব অথবা সুন্নত রয়ে গেছে, তাতে যে যতটুকু কোরআন সহজে পাঠ করতে পারে, পাঠ করুক। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ---এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, ফরয নামায পাঁচটি যা মি'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায এক বছর পর্যন্ত ফরয থাকাকালেই মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর পূর্বোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। সুতরাং সূরার শেষের اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আয়াতে পাঞ্জেগানা ফরয নামায বোঝানো যেতে পারে।---(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত)

এমনি ভাবে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ বাক্যে ফরয যাকাত বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এবং এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু ইবনে কাসীর বলেনঃ যাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরয হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে।---রূহুল-মা'আনীও তাই বলেছে।

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا---আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা

হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহ্কে ঋণ দিচ্ছে। এতে তার অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের দিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ধনীদের সেরা ধনী, তাঁকে দেওয়া ঋণ কখনও মারা যাবে না---অবশ্যই পরিশোধিত হবে। ফরয যাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে; যেমন আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনকে কিছু দেওয়া, মেহমানদের জন্য ব্যয় করা, আলিম ও সাধু পুরুষদের সেবাযত্ন করা ইত্যাদি। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কাজেই أَقْرِضُوا اللّٰهَ বাক্যে এসব ওয়াজিব পাওনা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ---অর্থাৎ তোমরা জীবদ্দশায় যে যে কাজ সম্পাদন কর, তা মৃত্যুর সময় সেই কাজের ওসীয়্যত করে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ, মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা স্বাধীন; তারা ওসীয়্যত পূর্ণ করতেও পারে, না-ও করতে পারে। এতে আর্থিক-ইবাদত, সদকা-খয়রাতসহ নামায-রোযা ইত্যাদিও দাখিল।

হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন: তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে নিজের ধনসম্পদের তুলনায় ওয়ারিশের ধনসম্পদকে বেশী ভালবাসে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন: নিজের ধনের চেয়ে ওয়ারিশের ধনকে বেশী ভালবাসে এরূপ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন: খুব বুঝেশুনে উত্তর দাও। সাহাবায়ে কিরাম বললেন: এই উত্তর ছাড়া আমাদের অন্য কোন উত্তর জানা নেই। তিনি বললেন: (আচ্ছা, তা হলে বুঝে নাও) তোমার ধন তাই, যা তুমি স্বহস্তে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে। তোমার মৃত্যুর পর যে ধন থেকে যাবে, তা তোমার ধন নয়---তোমার ওয়ারিশের ধন। ---(ইবনে কাসীর)
